ফাল্গুনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2250

94/68

6755

2250

ফাল্গুনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

5755

উৎসর্গ

যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর
তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে
তাহাদের এবং সেই সঙ্গে
সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী
আমার সকল গানের ভাণ্ডারী
শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথের হস্তে
এই নাট্যকাব্যটিকে
কবি-বাউলের একতারার মতো
সমর্পণ করিলাম

১৫ ফাল্গুন
১৩২২

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR.
৭৮/68
57.55
2250

পাত্রগণ

রাজা
মন্ত্রী
শ্রুতিভূষণ
কবিশেখর
নববসন্তের দূতগণ
শীত
নবযৌবনের দল

চন্দ্রহাস	...	উক্ত দলের প্রিয়সখা
দাদা	...	উক্ত দলের প্রবীণ যুবক
জীবনসর্দার	...	উক্ত দলের নেতা

অন্ধ বাউল
মাঝি
কোটাল
অনাথ কলু ইত্যাদি

এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দার ছাড়া আর-কাহারও নাম নির্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা খুশি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।

সূচনা

রাজোদ্যান

চুপ, চুপ, চুপ কর্ তোরা।

কেন, কী হয়েছে।

মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।

সর্বনাশ!

কে রে। কে বাজায় বাঁশি।

কেন ভাই, কী হয়েছে।

মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।

সর্বনাশ!

ছেলেগুলো দাপাদাপি করছে কার।

আমাদের মণ্ডলদের।

মণ্ডলকে সাবধান করে দে। ছেলেগুলোকে ঠেকাক।

মন্ত্রী কোথায় গেলেন।

এই-যে এখানেই আছি।

খবর পেয়েছেন কি।

কী বলো দেখি।

মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।

কিন্তু, প্রত্যন্তবিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেছে যে।

যুদ্ধ চলুক, কিন্তু তার সংবাদটা এখন চলবে না।

চীন-সম্রাটের দূত অপেক্ষা করছেন।

অপেক্ষা করতে দোষ নেই, কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।

ওই-যে মহারাজ আসছেন।

জয় হোক মহারাজের।

মহারাজ, সভায় যাবার সময় হল।

যাবার সময় হল বই-কি, কিন্তু সভায় যাবার নয়।

সে কী কথা, মহারাজ!

সভা ভাঙবার ঘণ্টা বেজেছে, শুনতে পেয়েছি।

কই, আমরা তো কেউ—

তোমরা শুনবে কী করে। ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েছে।

এতবড়ো স্পর্ধা কার হতে পারে।

মন্ত্রী, এখনও বাজাচ্ছে।

মহারাজ, দাসের স্থূলবুদ্ধি মাপ করবেন, বুঝতে পারলুম না।

এই চেয়ে দেখো—

মহারাজের চুল—

ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখতে পাচ্ছ না?

দাসের সঙ্গে পরিহাস ?

পরিহাস আমার নয়, মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীসুদ্ধ জীবের কানে ধরে পরিহাস করেন এ তাঁরই। গত রজনীতে আমার গলায় মল্লিকার মালা পরাবার সময় মহিষী চমকে উঠে বললেন, এ কী, মহারাজ, আপনার কানের কাছে দুটো পাকাচুল দেখছি যে।

মহারাজ, এজন্য খেদ করবেন না— রাজবৈদ্য আছেন, তিনি—

এ বংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কী করতে পেরেছিলেন। —মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। মহিষী এ দুটো চুল তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন ; আমি বললুম, কী হবে, রানী ! যমের পত্রই যেন সরালুম, কিন্তু যমের পত্রলিখককে তো সরানো যায় না। অতএব, এ পত্র শিরোধার্য করাই গেল। এখন তা হলে—

যে আজ্ঞা, এখন তা হলে রাজকার্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য। রাজকার্যের সময় নেই— শ্রুতিভূষণকে ডেকে আনো।

সেনাপতি বিজয়বর্মা—

না, বিজয়বর্মা না, শ্রুতিভূষণ।

মহারাজ, এ দিকে চীন-সম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড়ো সম্রাটের দূত অপেক্ষা করছেন। ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ, প্রত্যন্তসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী, প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেছে, ডাকো শ্রুতি-ভূষণকে।

মহারাজের শ্বশুর—

আমি যাঁর কথা বলছি তিনি আমার শ্বশুর নন। ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

আমাদের কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায় আনন্দে সঞ্চরণ করুন, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।

বোলো, সঙ্গে যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথিটা আনেন।

প্রতিহারী, বাইরে ওই কারা গোল করছে, বারণ করো ; আমি একটু শান্তি চাই।

নাগপত্তনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

আমার তো সময় নেই মন্ত্রী ; আমি শান্তি চাই।

তারা বলছে, তাদের সময় আরও অনেক অল্প— তারা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেছে ; তারা ক্ষুধাশান্তি চায়।

ক্ষুধাশান্তি! এ সংসারে কি ক্ষুধার শান্তি আছে। ক্ষুধানলের শান্তি চিতানলে।

তা হলে, মহারাজ, ওই হতভাগ্যদের—

ওই হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কালধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করা বৃথা, আজই হোক কালই হোক সে টেনে তুলবেই।

অতএব—

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্য-বারিধি পুঁথি।

প্রজারা তা হলে দুর্ভিক্ষ—

দেখো মন্ত্রী, ভিক্ষা তো অন্নের নয়, ভিক্ষা আয়ুর। সেই ভিক্ষায় জগৎ জুড়ে দুর্ভিক্ষ, কী রাজার, কী প্রজার। কে কাকে রক্ষা করবে।

অতএব—

অতএব, শ্মশানেশ্বর শিব যেখানে ডমরুধ্বনি করছেন সেইখানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাই-চাপা পড়বে— তবে কেন মিছে গলা ভাঙা। এই-যে শ্রুতিভূষণ, প্রণাম।

শুভমস্তু।

শ্রুতিভূষণমশায়, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে, অবসাদগ্রস্ত নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতিভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কী বলছেন।

উনি বলছেন, লক্ষ্মীর স্বভাব সম্বন্ধে মহারাজকে কিছু উপদেশ দিতে।

আপনার উপদেশ কী।

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন, মূঢ়, শুন।

অহো, আপনার উপদেশের এক ফুৎকারেই আশা-প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্বাপিত হয়ে যায়। আমাদের আচার্য বলেছেন না ?—

দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং।

মহারাজ, আশার কথা যদি তুললেন তবে বারিধি থেকে আর-একটি চৌপদী শোনাই—

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।

হায় হায়, অমূল্য আপনার বাণী। শ্রুতিভূষণকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এখনই— ও কী, মন্ত্রী, আবার কারা গোল করছে ?

সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনই শান্ত হতে বলো।

তা হলে, মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন-না— আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের পরামর্শটা—

না, না, যুদ্ধ পরে হবে, শ্রুতিভূষণকে ছাড়তে পারছি নে।

মহারাজ স্বর্ণমুদ্রা দেবার কথা বলছিলেন, কিন্তু সে দান যে ক্ষয় হয়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখছেন—

স্বর্ণদান করে যেই করে দুঃখ দান,
যত স্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ।
শত দাও, লক্ষ দাও, হয়ে যায় শেষ,
শূন্য ভাণ্ড ভরি শুধু থাকে মনঃক্লেশ।

আহা, শরীর রোমাঞ্চিত হল। প্রভু কি তা হলে—

না, আমি সহস্র মুদ্রা চাই নে।

দিন দিন, একটু পদধূলি দিন। সহস্র মুদ্রা চান না! এতবড়ো কথা!

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হয়ে যাতে মহারাজের পুণ্যফলকে অসীম করে আমি এমন কিছু চাই। গোধন-

সমেত. আপনার ওই কাঞ্চনপুর জনপদটি যদি ব্রহ্মত্র দান করেন কেবলমাত্র ওইটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব ; কারণ, বৈরাগ্যবারিধি বলছেন—

বুঝেছি, শ্রুতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাঞ্চনপুর জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন— আবার কী, বারবার কেন চীৎকার করছে।

চীৎকারটা বারবার করছে বটে, কিন্তু কারণটা একই রয়ে গেছে। ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বলতে বলেছেন, তিনি তাঁর সর্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝংকার ধ্বনিত করতে চান, কিন্তু আভরণের অভাববশত শব্দ বড়োই ক্ষীণ হয়ে বাজছে।

মন্ত্রী!

মহারাজ!

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন করতে যেন বিলম্ব না হয়।

আর, মন্ত্রীমশায়কে বলে দিন, আমরা সর্বদাই পরমার্থ-চিন্তায় রত, বৎসরে বৎসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হলে চিত্তবিক্ষেপ হয়। অতএব, রাজশিল্পী যদি আমার গৃহটি সুদৃঢ় ক'রে নির্মাণ করে দেয় তা হলে তার তলদেশে

শান্তমনে বৈরাগ্যসাধন করতে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ করে দাও।

মহারাজ, এ বৎসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে তো প্রতি বৎসরেই শুনে আসছি। মন্ত্রী, তোমাদের উপর ভার ধন বৃদ্ধি করবার, আর আমার উপর ভার অভাব বৃদ্ধি করবার। এই দুইয়ে মিলে সন্ধি করে হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারি নে। উনি দেখছেন আপনার অর্থ, আর আমরা দেখছি আপনার পরমার্থ; সুতরাং উনি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন অভাব আমরা সেইখানে দেখতে পাচ্ছি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে লিখছেন—

রাজকোষ পূর্ণ হয়ে তবু শূন্যমাত্র,
যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা—
পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হা। আপনাদের সঙ্গ অমূল্য।

কিন্তু, মহারাজের সঙ্গ কত মূল্যবান শ্রুতিভূষণমশায় তা বেশ জানেন। তা হলে আসুন, শ্রুতিভূষণ, বৈরাগ্যসাধনের ফর্দ যা দিলেন সেটা সংগ্রহ করা যাক।

চলুন তবে চলুন, বিলম্বে কাজ নেই।— মন্ত্রী এই

সামান্য বিষয় নিয়ে যখন এত অধীর হয়েছেন তখন ওঁকে শান্ত করে এখনই আবার ফিরে আসছি।

আমার সর্বদা ভয় হয় পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে অরণ্যে চলে যান।

মহারাজ, মনটা মুক্ত থাকলে কিছুই ত্যাগ করতে হয় না— এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই আমার অরণ্য। এক্ষণে তবে আসি। মন্ত্রী, চলো চলো।

ওই-যে কবিশেখর আসছে— আমার তপস্যা ভাঙলে বুঝি। ওকে ভয় করি। ওরে পাকাচুল, কান ঢেকে থাক্ রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়।

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান?

কবিত্ব যে বিদায়সংবাদ পাঠালে, এখন কবিকে রেখে হবে কী।

সংবাদটা কোথায় পৌঁছল।

ঠিক আমার কানের উপর। চেয়ে দেখো।

পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাবছেন কী।

যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে সাদা করার চেষ্টা।

কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ওই সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রঙ লাগবে।

কই, রঙের আভাস তো দেখি নে।

সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

চুপ, চুপ, চুপ করো, কবি, চুপ করো।

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আর-এক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন— নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

আরে, আরে, তুমি দেখছি বিপদ বাধাবে, কবি। যাও যাও তুমি যাও— ওরে, শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয়।

তাঁকে কেন, মহারাজ।

বৈরাগ্যসাধন করব।

সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

তুমি?

হাঁ, মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম, তবু বুঝতে পারলেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য,

ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য। সেইজন্যেই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

তোমাদের মন্ত্রটা কী।

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে— বেরিয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হল ?

তা নয় তো কী, মহারাজ। সংসারে যে কেবলই সরা, কেবলই চলা ; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সেই তো বৈরাগী, সেই তো পথিক, সেই তো কবি-বাউলের চেলা।

তা হলে শান্তি পাব কী করে।

শান্তির উপরে তো আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

কিন্তু, ধ্রুব সম্পদটি তো পাওয়া চাই !

ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।

সে কী কথা। বিপদ বাধাবে দেখছি। —ওরে, শ্রুতিভূষণকে ডাক্।

আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলই ছাড়তে ছাড়তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানি নে।

এ তোমার কিরকম কথা।

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি, মহারাজ। সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্ছে বালির মরুভূমি— তার মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল। তার দেওয়া যেমনি ঘোচে অমনি তার পাওয়াও ঘোচে।

ওই শোনো, কবিশেখর, কান্না শোনো। ওই তো তোমার সংসার।

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

আমার প্রজা? বল কী, কবি। সংসারের প্রজা ওরা। এ দুঃখ কি আমি সৃষ্টি করেছি। তোমার কবিত্বমন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কী প্রতিকার করতে পারে বলো তো।

মহারাজ, এ দুঃখকে তো আমরাই বহন করতে পারি। আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেছি। নদী কেমন ক'রে ভার বহন করে দেখেছেন তো? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারী করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো

সে আপনার ভার লাঘব করেছে ব'লেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখ-দুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দার যিনি তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেছেন, তাই তো বসে থাকতে পারি নে—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

যাক গে শ্রুতিভূষণ। ওহে কবিশেখর, আমার কী মুশকিল হয়েছে জান? তোমার কথা আমি এক বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারি নে, অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর, শ্রুতিভূষণের ঠিক তার উল্‌টো ; তার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে, ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে, কিন্তু সুরটা— সে কী আর বলব।

মহারাজ, আমাদের কথা তো বোঝবার জন্যে হয় নি, বাজবার জন্যে হয়েছে।

এখন তোমার কাজটা কী বলো তো, কবি।

মহারাজ, ওই-যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে, ওই কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে।

ওহে কবি, বল কী তুমি। এ-সমস্ত কেজো লোকের

কাজ। তুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কী করবে।

কেজো লোকেরা কাজ বেসুরো করে ফেলে, তাই সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আসতে হয়।

ওহে কবি, আর-একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।

মহারাজ, ওরা কর্তব্যকে ভালোবাসে ব'লে কাজ করে, আমরা প্রাণকে ভালোবাসি ব'লে কাজ করি—এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্মা ; আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জীব।

কিন্তু, জিতটা হল কার।

আমাদের, মহারাজ, আমাদের।

তার প্রমাণ ?

পৃথিবীতে যা-কিছু সকলের বড়ো তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে-মুছে ফেলতে পার তা হলেই প্রমাণ হবে, এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলখেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেছে কারা। মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ওই-যে কান্না উঠেছে সে কান্না থামায় কারা। যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপছে

6.1.94
7666

তারাও নয়— যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে ব'লেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে— সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব-চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।

ওহে কবি, তা হলে তুমি আমাকে কী করতে বল।

উঠতে বলি, মহারাজ, চলতে বলি। ওই-যে কান্না, ও-যে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান। কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা— কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে, তবে অকর্তব্য হল ব'লে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেছি ব'লে।

কিন্তু, মরবই যে, কবিশেখর, আজ হোক আর কাল হোক।

কে বললে, মহারাজ। মিথ্যা কথা! যখন দেখছি বেঁচে আছি, তখন জানছি যে বাঁচবই; যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই করে দেখলে না সেই বলে 'মরব', সেই বলে—

নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বৎ জীবনমতিশয়চপলং।

কী বল হে, কবি, জীবন চপল নয়?

চপল বই-কি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা করতে করতেই চলবে। মহারাজ, আজ তুমি তার চপলতা বন্ধ ক'রে মরবার পালা অভিনয় করতে বসেছ ?

ঠিক বলছ, কবি ? আমরা বাঁচবই ?

বাঁচবই।

যদি বাঁচবই তবে বাঁচার মতো করেই বাঁচতে হবে—কী বল।

হাঁ, মহারাজ।

প্রতিহারী !

কী, মহারাজ।

ডাকো, ডাকো, মন্ত্রীকে এখনই ডাকো।

কী, মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ কেন।

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে।

বিজয়বর্মাকে বিদায় করে দিতে।

কী মুশকিল। বিদায় করবে কেন। যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে।

চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের।

মহারাজের তো দর্শন হবে না, তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী, আশ্চর্য করলে দেখছি— রাজকার্য কি এমনি করেই চলবে। হঠাৎ তোমার হল কী।

তার পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙবার জন্যে লোকের সন্ধান করছিলুম— আর তো কেউ রাজি হয় না, কেবল দিঙ্‌নাগের বংশে যাঁরা অলংকারের আর ব্যাকরণশাস্ত্রের টোল খুলেছেন তাঁরা দলে দলে শাবল হাতে ছুটে আসছেন।

সর্বনাশ! মন্ত্রী, পাগল হলে নাকি। কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবে?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙতে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির করেছেন, কবিশেখরের ওই বাসাটা আজ থেকে তিনিই দখল করবেন।

কী বিপদ। সরস্বতী যে তা হলে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন। না, না, সে হবে না।

আর-একটা কাজ ছিল— শ্রুতিভূষণকে কাঞ্চনপুরের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ওহো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হয়েছে বুঝি? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কী কথা, মহারাজ। আমার পুরস্কার তো জনপদ নয়— আমরা জন-পদের সেবা তো কখনও করি নি, তাই ওই পদপ্রাপ্তিটা আশাও করি নে!

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যেই থাক্।

আর, মহারাজ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বিদায় করবার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান করেছি।

মন্ত্রী, আজ দেখছি, পদে পদে তোমার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটছে। দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ!

কী, প্রতিহারী।

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেছেন।

সর্বনাশ করলে! ফেরাও তাকে ফেরাও। মন্ত্রী, দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ না এসে পড়ে। আমার দুর্বল মন, হয়তো সামলাতে পারব না, হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়ব। —ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না, প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো, একটা যা-হয়-কিছু করো, যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি-তাই করছে তেমনিতরো। হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিম্বা প্রকরণ, কিম্বা রূপক, কিম্বা ভাণ, কিম্বা—

তৈরি আছে, কিন্তু সেটা নাটক কি প্রকরণ কি রূপক কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না।

যা রচনা করেছ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব।

না, মহারাজ। রচনা তো অর্থগ্রহণ করবার জন্যে নয়।

তবে ?

সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি তো বলেছি, আমার এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।

বল কী হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই ?

কিচ্ছু না।

তবে তোমার ও রচনাটা বলছে কী।

ও বলছে 'আমি আছি'। শিশু জন্মাবা-মাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন, মহারাজ ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায়, জল স্থল আকাশ তাকে চারি দিক থেকে ব'লে উঠেছে 'আমি আছি'। তারই উত্তরে ওই প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে ব'লে ওঠে 'আমি আছি'। আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।

তার বেশি আর কিচ্ছু না ?

কিচ্ছু না। আমার রচনার মধ্যে প্রাণ ব'লে উঠেছে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে,

লোকে লোকান্তরে জয় এই 'আমি-আছি'র জয়, জয় এই আনন্দময় 'আমি-আছি'র জয়।

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাকলে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস চলবে না।

সে কথা সত্য, মহারাজ। আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না। ওরা বুদ্ধিমান।

তা হলে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়। আমার রাজ-বিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের ডাকব কি।

না, মহারাজ, তারা কাব্য শুনেও তর্ক করে। নতুন-শিঙ-ওঠা হরিণশিশুর মতো ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়।

তবে ?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেছে।

সে কী কথা, কবি।

হাঁ, মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।

ওহে কবি, তবে তো এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য শোনবার বয়েস হয়েছে। বিজয়বর্মাকেও ডাকা যাক।

ডাকুন।

চীন-সম্রাটের দূতকে ?

ডাকুন।

আমার শ্বশুর এসেছেন শুনছি—

তাঁকে ডাকতে পারেন, কিন্তু শ্বশুরের ছেলেগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তাই ব'লে শ্বশুরের মেয়ের কথাটা ভুলো না, কবি।

আমি ভুললেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশঙ্কা নেই।

আর, শ্রুতিভূষণকে ?

না, মহারাজ, তাঁর প্রতি তো আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাব।

কবি, তা হলে প্রস্তুত হও গে।

না, মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।

চিত্রপট—

চিত্রপটে প্রয়োজন নেই— আমার দরকার চিত্তপট, সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।

এ নাটকে গান আছে নাকি।

হাঁ, মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।

গানের বিষয়টা কী।

শীতের বস্ত্রহরণ।

এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায় নি।

বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।

এ তো গেল গানের কথা, বাকিটা ?

বাকিটা প্রাণের কথা।

সে কিরকম।

যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে ব'লে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তখন—

তখন কী দেখলে।

কী দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

কিন্তু, একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি।

না, মহারাজ— বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্ব-কবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে।

এক হচ্ছে সর্দার।

সে কে।

যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর-একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস।

সে কে।

যাকে আমরা ভালোবাসি— আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় করেছে।

আর কে আছে।

দাদা— প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেছে।

আর-কেউ আছে?

আর আছে এক অন্ধ বাউল।

অন্ধ?

হাঁ, মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখে না ব'লেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্রদের মধ্যে আর কে আছে।

আপনি আছেন।

আমি?

হাঁ, মহারাজ, আপনি যদি এর ভিতরে না থেকে বাইরেই থাকেন তা হলে কবিকে গাল দিয়ে বিদায় ক'রে ফের শ্রুতিভূষণকে নিয়ে বৈরাগ্যবারিধির চৌপদী-ব্যাখ্যায় মন দেবেন। তা হলে মহারাজের আর মুক্তির আশা নাই। স্বয়ং বিশ্বকবি হার মানবেন— ফাল্গুনের দক্ষিণহাওয়া দক্ষিণা না পেয়েই বিদায় হবে।

প্রথম দৃশ্যের গীতিভূমিকা

নবীনের আবির্ভাব

১

বেণুবনের গান

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন-পাতার-পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা এসো আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।
ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা কানে-কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে॥

২

পাখির নীড়ের গান

আকাশ আমায় ভরল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জ্বলাস,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হল রঙিন তানে।
দখিনহাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস।
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে॥

৩

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।
ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে
আপন-হারা।
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তার—
বোঝে নিশার নীরব তারা॥

প্রথম দৃশ্য

সূত্রপাত

পথ

যুবকদলের প্রবেশ

গান

ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।
হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।

তাই বুঝি বারে বারে   কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে॥

ফাগুনের গুণ আছে রে ভাই, গুণ আছে।

বুঝলি কী করে।

নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে কিসের জোরে।

তাই তো— দাদা আমাদের চৌপদীছন্দের বোঝাই নৌকো, ফাগুনের গুণে বাঁধা পড়ে কাগজ-কলমের উলটো মুখে উজিয়ে চলেছে।

চন্দ্রহাস॥ ওরে, ফাগুনের গুণ নয় রে। আমি চন্দ্রহাস, দাদার তুলট কাগজের হলদে পাতাগুলো পিয়ালবনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি ; দাদা খুঁজতে বের হয়েছে।

তুলট কাগজগুলো গেছে আপদ গেছে, কিন্তু দাদার সাদা চাদরটা তো কেড়ে নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রহাস॥ তাই তো, আজ পৃথিবীর ধুলোমাটি পর্যন্ত শিউরে উঠেছে, আর এপর্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তের আমেজ লাগল না।

দাদা॥ আহা, কী মুশকিল। বয়েস হয়েছে যে।

পৃথিবীর বয়েস অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু

নবীন হতে ওর লজ্জা নেই।

চন্দ্রহাস॥ দাদা, তুমি বসে বসে চৌপদী লিখছ, আর এই চেয়ে দেখো, সমস্ত জল স্থল কেবল নবীন হবার তপস্যা করছে।

দাদা, তুমি কোটরে বসে কবিতা লেখ কী করে।

দাদা॥ আমার কবিতা তো তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মতো শৌখিন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছে রে, ভার আছে।

যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।

দাদা॥ শোন্ তবে বলি—

ওই রে, দাদা এবার চৌপদী বের করবে।

এল রে এল, চৌপদী এল। আর ঠেকানো গেল না।

ভো ভো পথিকবৃন্দ, সাবধান, দাদার মত্ত চৌপদী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রহাস॥ না দাদা, তুমি ওদের কথায় কান দিয়ো না। শোনাও তোমার চৌপদী। কেউ না টিঁকতে পারে আমি শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকব। আমি ওদের মতো কাপুরুষ নই।

আচ্ছা বেশ, আমরাও শুনব।

যেমন করে পারি শুনবই।

খাড়া দাঁড়িয়ে শুনব। পালাব না।

চৌপদীর চোট যদি লাগে তো বুকে লাগবে, পিঠে লাগবে না।

কিন্তু, দোহাই দাদা, একটা। তার বেশি নয়।

দাদা॥ আচ্ছা, তবে তোরা শোন্—

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে
যেহেতু সে লাগে বিশ্বকাজে।

আর-একটু ধৈর্য ধরো ভাই, এর মানেটা—

আবার মানে?

একে চৌপদী, তার উপর আবার মানে?

দাদা॥ একটু বুঝিয়ে দিই— অর্থাৎ, বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজত তা হলে—

না, আমরা বুঝব না।

কোনোমতেই বুঝব না।

কার সাধ্য আমাদের বোঝায়।

আমরা কিচ্ছু বুঝব না ব'লেই আজ বেরিয়ে পড়েছি।

আজ কেউ যদি আমাদের জোর ক'রে বোঝাতে চায় তা হলে আমরা জোর ক'রে ভুল বুঝব।

দাদা ॥ ও শ্লোকটার অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশ্বের হিত যদি না করি তবে—

তবে ? তবে বিশ্ব হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

দাদা ॥ ওই কথাটাকেই আর-একটু স্পষ্ট করে বলেছি—

অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে সশঙ্ক নিশীথে।
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কার হিতে।
শূন্যে কোন্ পুণ্য আছে আলোক বাঁটিতে।
মর্তে এলে কর্মে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।

ওহে, তবে আমাদের কথাটাকেও আর-একটু পষ্ট ক'রে বলতে হল দেখছি। ধরো দাদাকে ধরো— ওকে আড়্কোলা ক'রে নিয়ে চলো ওর কোটরে।

দাদা ॥ তোরা অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন বল্ তো। বিশেষ কাজ আছে ?

বিশেষ কাজ।

অত্যন্ত জরুরী।

দাদা ॥ কাজটা কী শুনি।

বসন্তের ছুটিতে আমাদের খেলাটা কী হবে তাই খুঁজে বের করতে বেরিয়েছি।

দাদা ॥ খেলা ? দিনরাতই খেলা ?

সকলের গান

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি, ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

ওই-যে আমাদের সর্দার আসছে, ভাই।

আমাদের সর্দার !

সর্দার ॥ কী রে, ভারি গোল বাধিয়েছিস যে।

চন্দ্রহাস ॥ তাই বুঝি থাকতে পারলে না ?

সর্দার ॥ বেরিয়ে আসতে হল।

ওই জন্যেই গোল করি।

সর্দার ॥ ঘরে বুঝি টিঁকতে দিবি নে ?

তুমি ঘরে টিঁকলে আমরা বাইরে টিঁকি কী করে।

চন্দ্রহাস ॥ এতবড়ো বাইরেটা পত্তন করতে তো চন্দ্র সূর্য তারা কম খরচ হয় নি; এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তবে বিধাতার মুখরক্ষা হবে।

সর্দার ॥ তোদের কথাটা কী হচ্ছে বল্ তো।

কথাটা হচ্ছে এই—

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি, ভাই।

সর্দার ॥ খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল,
খেলতে খেলতে ফল যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্ব'লে যে হয় ছাই।

সকলে ॥ মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই ॥

আমাদের এই খেলাটাতেই দাদার আপত্তি।

দাদা ॥ কেন আপত্তি করি বলব? শুনবি?

বলতে পার দাদা, কিন্তু শুনব কি না তা বলতে পারি নে।

দাদা ॥ সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভূরি ভূরি।
কিন্তু, চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই তো খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

চন্দ্রহাস॥ বল কী তুমি, দাদা, সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য।

দাদা॥ তা হলে কাজটা ?

চন্দ্রহাস॥ চলার বেগে যে ধুলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ।

দাদা॥ আচ্ছা, সর্দার, তুমি এর নিষ্পত্তি করে দাও।

সর্দার॥ আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করি নে। সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি— ওই আমার সর্দারি।

দাদা॥ সব জিনিসের সীমা আছে কিন্তু তোদের যে কেবলই ছেলেমানুষি !

তার কারণ, আমরা যে কেবলই ছেলেমানুষ ! সব জিনিসের সীমা আছে, কেবল ছেলেমানুষির সীমা নেই।

দাদাকে ঘেরিয়া নৃত্য

দাদা॥ তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না।

না, হবে না বয়েস, হবে না।

বুড়ো হয়ে মরব, তবু বয়েস হবে না।

বয়েস হলেই সেটাকে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, নদী পার করে দেব।

মাথা মুড়োবার খরচ লাগবে না, ভাই— তার মাথাভরা টাক।

গান

আমাদের পাকবে না চুল গো— মোদের
পাকবে না চুল।
আমাদের ঝরবে না ফুল গো— মোদের
ঝরবে না ফুল।
আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে,
ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে।
আমাদের ঘুচবে না ভুল গো— মোদের
ঘুচবে না ভুল।

সর্দার ॥ আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান,
করব না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজব না জ্ঞান,
খুঁজব না জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর-পানে শিখর হতে রে,
আমাদের মিলবে না কূল গো— মোদের
মিলবে না কূল॥

এই উঠতি বয়সেই দাদার যেরকম মতিগতি, তাতে কোন্ দিন উনি সেই বুড়োর কাছে মন্তর নিতে যাবেন— আর দেরি নেই।

সর্দার ॥ কোন্ বুড়ো রে।

চন্দ্রহাস ॥ সেই-যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না।

সর্দার ॥ তার খবর তোরা পেলি কোথা থেকে।

যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তার কথা বলে।

পুঁথিতে তার কথা লেখা আছে।

সর্দার ॥ তার চেহারাটা কিরকম।

কেউ বলে সে সাদা, মড়ার মাথার খুলির মতো ; কেউ বলে সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মতো।

কেন, তুমি কি তার খবর রাখ না, সর্দার।

সর্দার ॥ আমি তাকে বিশ্বাস করি নে।

বাঃ, তুমি যে উল্‌টো কথা বললে। সেই বুড়োই তো সব-চেয়ে বেশি করে আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তার বাসা।

পণ্ডিতজি বলে, বিশ্বাস যদি কাউকে না করতে হয় সে কেবল আমাদের। আমরা আছি কি নেই তার কোনো ঠিকানাই নেই।

চন্দ্রহাস ॥ আমরা যে ভারী কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায়।

সর্দার ॥ সর্বনাশ করলে দেখছি। তোরা পণ্ডিতের কাছে আনাগোনা শুরু করছিস নাকি।

তাতে ক্ষতি কী, সর্দার।

সর্দার॥ পুঁথির বুলির দেশে ঢুকলে যে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যাবি। কার্তিক-মাসের সাদা কুয়াশার মতো। তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রঙ থাকবে না। আচ্ছা, এক কাজ কর্। তোরা খেলার কথা ভাবছিলি?

হাঁ সর্দার, ভাবনায় আমাদের চোখে ঘুম ছিল না।

আমাদের ভাবনার চোটে পাড়ার লোক রাজদরবারে নালিশ করতে ছুটেছিল।

সর্দার॥ একটা নতুন খেলা বলতে পারি।

বলো, বলো, বলো।

সর্দার॥ তোরা সবাই মিলে বুড়োটাকে ধরে নিয়ে আয়।

নতুন বটে, কিন্তু এটা ঠিক খেলা কি না জানি নে।

সর্দার॥ আমি বলছি, এ তোরা পারবি নে।

পারব না? বলো কী। পারবই।

সর্দার॥ কখনও পারবি নে।

আচ্ছা, যদি পারি?

সর্দার॥ তা হলে গুরু ব'লে আমি তোদের মানব।

গুরু! সর্বনাশ! আমাদের সুদ্ধ বুড়ো বানিয়ে দেবে?

সর্দার॥ তবে কী চাস বল্।

তোমার সর্দারি আমরা কেড়ে নেব।

সর্দার ॥ তা হলে তো বাঁচি রে। তোদের সর্দারি কি সোজা কাজ। এমনি অস্থির করে রেখেছিস যে হাড়গুলো-সুদ্ধ উল্‌টো-পাল্‌টা হয়ে গেছে।— তা হলে রইল কথা ?

চন্দ্রহাস ॥ হাঁ, রইল কথা। দোলপূর্ণিমার দিনে তাকে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে দেব।

তাকে নিয়ে কী করবে, সর্দার।

সর্দার ॥ বসন্ত-উৎসব করব।

বল কী। তা হলে যে আমের বোলগুলো ধরতে ধরতেই আঁটি হয়ে যাবে।

আর, কোকিলগুলো পেঁচা হয়ে সব লক্ষ্মীর খোঁজে বেরোবে।

চন্দ্রহাস ॥ আর ভ্রমরগুলো অনুস্বার-বিসর্গের চোটে বাতাসটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে মন্তর জপতে থাকবে।

সর্দার ॥ আর, তোদের খুলিটা সুবুদ্ধিতে এমনি বোঝাই হবে যে এক পা নড়তে পারবি নে।

সর্বনাশ !

সর্দার ॥ আর, ওই ঝুমকো-লতায় যেমন গাঁঠে গাঁঠে ফুল ধরেছে তেমনি তোদের গাঁঠে গাঁঠে বাতে ধরবে।

সর্বনাশ !

সর্দার ॥ আর, তোরা সবাই নিজের দাদা হয়ে নিজের

কান মলতে থাকবি।

সর্বনাশ!

সর্দার॥ আর—

আর কাজ কী, সর্দার। থাক্ বুড়ো-ধরা খেলা। ওটা বরঞ্চ শীতের দিনেই হবে। এবার তোমাকে নিয়েই—

সর্দার॥ তোদের দেখছি আগে থাকতেই বুড়োর ছোঁয়াচ লেগেছে।

কেন, কী লক্ষণটা দেখলে।

সর্দার॥ উৎসাহ নেই? গোড়াতেই পেছিয়ে গেলি? দেখ্‌ই-না কী হয়।

আচ্ছা, বেশ। রাজি।

চল্ রে সব চল্।

বুড়োর খোঁজে চল্।

যেখানে পাই তাকে পাকা চুলটার মতো পট্ করে উপড়ে আনব।

শুনেছি, উপড়ে আনার কাজে তারই হাত পাকা। নিড়ুনি তার প্রধান অস্ত্র।

ভয়ের কথা রাখ্‌। খেলতেই যখন বেরোলুম তখন ভয়, চৌপদী, পণ্ডিত, পুঁথি, এ-সব ফেলে যেতে হবে।

আমাদের ভয় কাহারে।
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের করতে পারে।
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,
নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে না রে।
আমরা চাই নে আরাম, চাই নে বিরাম,
চাই নে যে ফল, চাই নে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে—
আমাদের ভয় কাহারে॥

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকা

প্রবীণের দ্বিধা

১

দুরন্ত প্রাণের গান

আমরা খুঁজি খেলার সাথি।
ভোর না হতে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারারাতি।
আমরা ডাকি পাখির গলায়,
আমরা নাচি বকুলতলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি।
মরণকে তো মানি নে রে,
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়ব না গো তোমায় মোরা,
চলেছ কোন্ আঁধার-পানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি॥

২

শীতের বিদায়-গান

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চলব সাগর-পার গো।
বিদায়-বেলায় এ কী হাসি,
ধরলি আগমনীর বাঁশি।
যাবার সুরে আসার সুরে
করলি একাকার গো।
সবাই আপনপানে
আমায় আবার কেন টানে!
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তারে এমন নূতন করা ?
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো॥

৩

নবযৌবনের গান

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে, শীত, ভাবছ বুঝি।
ও-সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিনহাওয়ার 'পর।
তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে,
নাই যে অগোচর গো॥

৪

উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান

ছাড়্ গো আমায় ছাড়্ গো—
আমি চলব সাগর-পার গো।
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস নে, ভাই, আর গো॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সন্ধান

ঘাট

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো।

মাঝি ॥ কেন গো, তোমরা কাকে চাও।

আমরা বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

মাঝি ॥ কোন্ বুড়োকে।

চন্দ্রহাস ॥ কোন্-বুড়োকে না। বুড়োকে।

মাঝি ॥ তিনি কে।

চন্দ্রহাস ॥ আহা, আদ্যিকালের বুড়ো।

মাঝি ॥ ও, বুঝেছি। তাকে নিয়ে করবে কী।

বসন্ত-উৎসব করব।

মাঝি ॥ বুড়োকে নিয়ে বসন্ত-উৎসব? পাগল হয়েছ?

পাগল হঠাৎ হই নি। গোড়া থেকেই এই দশা।

আর, অন্তিম পর্যন্তই এই ভাব।

গান

আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে।

ছুটল বেগে ফাগুনহাওয়া
কোন্ খেপামির নেশায় পাওয়া।
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্যতারাকে।

মাঝি॥ ওহে, তোমাদের হাওয়ার জোর আছে—দরজায় ধাক্কা লাগিয়েছে।

এখন সেই বুড়োটার খবর দাও।

মাঝি॥ সেই-যে বুড়িটা রাস্তার মোড়ে ব'সে চরকা কাটে তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না ?

জিজ্ঞাসা করেছিলুম—সে বলে, সামনে দিয়ে কত ছায়া যায়, কত ছায়া আসে, কাকেই বা চিনি।

ও যে একই জায়গায় ব'সে থাকে, ও কারও ঠিকানা জানে না।

মাঝি, তুমি ঘাটে ঘাটে অনেক ঘুরেছ, তুমি নিশ্চয় বলতে পার কোথায় সেই—

মাঝি॥ ভাই, আমার ব্যাবসা হচ্ছে পথ ঠিক করা; কাদের পথ, কিসের পথ, সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।

আচ্ছা, চলো তো, পথগুলো পরখ করে দেখা যাক।

কোন্ খেপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর।

সেই তালে যে পা ফেলে যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্ রে সোজা, ফেল্ রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে॥

মাঝি॥ ওই-যে কোটাল আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয়— আমি পথের খবর জানি, ও পথিকদের খবর জানে।

ওহে কোটাল হে, কোটাল হে।

কোটাল॥ কে গো, তোমরা কে।

আমাদের যা দেখছ তাই, পরিচয় দেবার কিছুই নেই।

কোটাল॥ কী চাই।

চন্দ্রহাস॥ বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

কোটাল॥ কোন্ বুড়োকে।

সেই চিরকালের বুড়োকে।

কোটাল॥ এ তোমাদের কেমন খেয়াল। তোমরা খোঁজ তাকে? সেই তো তোমাদের খোঁজ করছে।

চন্দ্রহাস॥ কেন বলো তো।

কোটাল॥ সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে নিতে চায়,

তপ্ত যৌবনের 'পরে তার বড়ো লোভ।

চন্দ্রহাস॥ আমরা তাকে কষে গরম করে দেব, সে ভাবনা নেই। এখন দেখা পেলে হয়। তুমি তাকে দেখেছ?

কোটাল॥ আমার রাতের বেলার পাহারা— দেখি ঢের লোক, চেহারা বুঝি নে। কিন্তু, বাপু, তাকেই সকলে বলে ছেলে-ধরা, উল্‌টে তোমরা তাকে ধরতে চাও— এটা যে পুরো পাগলামি।

দেখেছ? ধরা পড়েছি। পাগলামিই তো। চিনতে দেরি হয় না।

কোটাল॥ আমি কোটাল, পথ-চলতি যাদের দেখি সবাই এক ছাঁচের। তাই অদ্ভুত কিছু দেখলেই চোখে ঠেকে।

ওই শোনো! পাড়ার ভদ্রলোক-মাত্রই ওই কথা বলে— আমরা অদ্ভুত।

আমরা অদ্ভুত বই-কি, কোনো ভুল নেই।

কোটাল॥ কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষি করছ।

ওই রে, আবার ধরা পড়েছি। দাদাও ঠিক ওই কথাই বলে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা ছেলেমানুষিই করছি।

ওতে আমরা একেবারে পাকা হয়ে গেছি।

চন্দ্রহাস॥ আমাদের এক সর্দার আছে, সে ছেলে-মানুষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হূহু করে

চলেছে যে তার বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হুঁশ নেই।

কোটাল॥ আর, তোমরা?

আমরা সব বয়েসের গুটি-কাটা প্রজাপতি।

কোটাল॥ (জনান্তিকে মাঝির প্রতি) পাগল রে, একেবারে উন্মাদ পাগল!

মাঝি॥ বাপু, এখন তোমরা কী করবে।

চন্দ্রহাস॥ আমরা যাব।

কোটাল॥ কোথায়।

চন্দ্রহাস॥ সেটা আমরা ঠিক করি নি।

কোটাল॥ যাওয়াটাই ঠিক করেছ, কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক কর নি?

চন্দ্রহাস॥ সেটা চলতে চলতে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

কোটাল॥ তার মানে কী হল।

তার মানে হচ্ছে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগনতলে।

বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

কোটাল॥ তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হলে গান গাও?

হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরোয় না। সাদা কথায় বলতে গেলে ভারী অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।

কোটাল॥ তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের গানগুলো খুব পষ্ট।

চন্দ্রহাস॥ হাঁ, ওতে সুর আছে কিনা।

পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিকজনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে॥

কোটাল ॥ কোনো সহজ মানুষকে তো কথা বলতে বলতে গান গাইতে শুনি নি!

আবার ধরা পড়ে গেছি রে, আমরা সহজ মানুষ না।

কোটাল ॥ তোমাদের কোনো কাজকর্ম নেই বুঝি ?

না। আমাদের ছুটি।

কোটাল ॥ কেন বলো তো।

চন্দ্রহাস ॥ পাছে সময় নষ্ট হয়।

কোটাল ॥ এটা তো বোঝা গেল না।

ওই দেখো— তা হলে আবার গান ধরতে হল।

কোটাল ॥ না, তার দরকার নেই। আর বেশি বোঝবার আশা রাখি নে।

সবাই আমাদের বোঝবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কোটাল ॥ এমন হলে তোমাদের চলবে কী করে।

চন্দ্রহাস ॥ আর তো কিছুই চলবার দরকার নেই— শুধু আমরাই চলি।

কোটাল ॥ (মাঝির প্রতি) পাগল রে! উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস ॥ এই-যে এতক্ষণ পরে দাদা আসছে।

কী দাদা, পিছিয়ে পড়েছিলে কেন।

চন্দ্রহাস ॥ ওরে, আমরা চলি উনপঞ্চাশ বায়ুর মতো, আমাদের ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই; আর, দাদা চলে শ্রাবণের মেঘ— মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে ভারমোচন

করতে হয়। পথের মধ্যে ওকে শ্লোকরচনায় পেয়েছিল্।

দাদা॥ চন্দ্রহাস, দৈবাৎ তোমার মুখে এই উপমাটি উপাদেয় হয়েছে। ওর মধ্যে একটু সার কথা আছে। আমি ওটি চৌপদীতে গেঁথে নিচ্ছি।

চন্দ্রহাস॥ না, না, এখন থাক্ দাদা। আমরা কাজে বেরিয়েছি। তোমার চৌপদীর চার পা, কিন্তু চলবার বেলা এতবড়ো খোঁড়া জন্তু জগতে দেখতে পাওয়া যায় না।

দাদা॥ আপনি কে।

মাঝি॥ আমি ঘাটের মাঝি।

দাদা॥ আর আপনি?

কোটাল॥ আমি পাড়ার কোটাল।

দাদা॥ তা, উত্তম হল— আপনাদের কিছু শোনাতে ইচ্ছা করি। বাজে জিনিস না, কাজের কথা।

মাঝি॥ বেশ, বেশ। আহা, বলেন, বলেন।

কোটাল॥ আমাদের গুরু বলেছিলেন, ভালো কথা বলবার লোক অনেক মেলে কিন্তু ভালো কথা যে-মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শুনতে পারে তাকেই সাবাস। ওটা ভাগ্যের কথা কিনা। তা, বলো ঠাকুর, বলো।

দাদা॥ আজ পথে যেতে যেতে দেখলুম, রাজপুরুষ একজন বন্দীকে নিয়ে চলেছে। শুনলুম, সে কোনো শ্রেষ্ঠী, তার টাকার লোভেই রাজা মিথ্যা ছুতো করে তাকে ধরেছে।

শুনে আমি নিকটেই মুদির দোকানে বসে এই শ্লোকটি রচনা করেছি। দেখো বাপু, আমি বানিয়ে একটি কথাও লিখি নে। আমি যা লিখব রাস্তায় ঘাটে তা মিলিয়ে নিতে পারবে।

ঠাকুর, কী লিখেছ শুনি।

দাদা ॥ আত্মরস লক্ষ্য ছিল ব'লে
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে।
ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।

বুঝেছ ? রস জমায় বলেই ইক্ষু বেটা মরে, যে গাছ ফল দেয় তাকে তো কেউ মারে না !

কোটাল ॥ ওহে মাঝি, খাসা লিখেছে হে।

মাঝি ॥ ভাই কোটাল, কথাটির মধ্যে সার আছে।

কোটাল ॥ শুনলে মানুষের চৈতন্য হয়। আমাদের কায়েতের পো এখানে থাকলে ওটা লিখে নিতুম রে। পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে।

সর্বনাশ করলে রে।

চন্দ্রহাস ॥ ও ভাই মাঝি, তুমি যে বললে আমাদের সঙ্গে বেরোবে, দাদার চৌপদী জমলে তো আর—

মাঝি ॥ আরে রসুন, মশায়, পাগলামি রেখে দিন। ঠাকুরকে পেয়েছি, ছুটো ভালো কথা শুনে নিই— বয়েস হয়ে এল, কোন্ দিন মরব।

ভাই, সেইজন্যেই তো বলছি, আমাদের সঙ্গ পেয়েছ, ছেড়ো না।

চন্দ্রহাস॥ দাদাকে চিরদিনই পাবে কিন্তু আমরা একবার ম'লে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন ভুল করবেন না।

বাহির হইতে॥ ওগো কোটাল, কোটাল, কোটাল!

কে রে। অনাথ কলু দেখছি। কী হয়েছে।

কলু॥ সেই-যে ছেলেটাকে পুষেছিলুম, তাকে বুঝি কাল রাত্রে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সেই ছেলে-ধরা।

কোন্ ছেলে-ধরা।

কলু॥ সেই বুড়ো।

চন্দ্রহাস॥ বুড়ো? বলিস কী রে।

কলু॥ আপনারা অত খুশি হন কেন।

ওটা আমাদের একটা বিশ্রী স্বভাব। আমরা খামকা খুশি হয়ে উঠি।

কোটাল॥ পাগল! একেবারে উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস॥ তাকে তুমি দেখেছ হে?

কলু॥ বোধ হয় কাল রাত্রে তাকেই দূর থেকে দেখেছিলুম।

কিরকম চেহারাটা।

কলু॥ কালো, আমাদের এই কোটালদাদার চেয়েও। একেবারে রাত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আর, বুকে দুটো চক্ষু

জোনাক-পোকার মতো জ্বলছে।

ওহে, বসন্ত-উৎসবে তো মানাবে না।

চন্দ্রহাস॥ ভাবনা কী। তেমন যদি দেখি তবে এবার নাহয় পূর্ণিমায় উৎসব না করে অমাবস্যায় করা যাবে। অমাবস্যার বুকে তো চোখের অভাব নেই।

কোটাল॥ ওহে বাপু, তোমরা ভালো কাজ করছ না।

না, আমরা ভালো কাজ করছি নে।

আবার ধরা পড়েছি রে, আমরা ভালো কাজ করছি নে।

কী করব, অভ্যাস নেই।

যেহেতু আমরা ভালোমানুষ নই।

কোটাল॥ এ কি ঠাট্টা পেয়েছ। এতে বিপদ আছে।

বিপদ? সেইটেই তো ঠাট্টা:

গান

ভালোমানুষ নই রে মোরা
ভালোমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ওই।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কই নে মোরা
উল্‌টো কথা কই।

কোটাল ॥ ওহে বাপু, তোমরা যে কোন্ সর্দারের কথা বলছিলে, সে গেল কোথায়। সে সঙ্গে থাকলে যে তোমাদের সামলাতে পারত।

সে সঙ্গে থাকে না পাছে সামলাতে হয়।

সে আমাদের পথে বের করে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ায়।

কোটাল ॥ এ তার কেমনতরো সর্দারি।

চন্দ্রহাস ॥ সর্দারি করে না বলেই তাকে সর্দার করেছি।

কোটাল ॥ দিব্যি সহজ কাজটি তো সে পেয়েছে।

চন্দ্রহাস ॥ না ভাই, সর্দারি করা সহজ, সর্দার হওয়া সহজ নয়।

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা—
রাখি নে, ভাই, ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বই॥

দাদা, চলো তবে, বেরিয়ে পড়ি।

কোটাল॥ না, না, ঠাকুর, ওদের সঙ্গে কোথায় মরতে যাবে।

মাঝি॥ তুমি আমাদের শোলোক শোনাও, পাড়ার মানুষ সব এল বলে। এ-সব কথা শোনা ভালো।

দাদা॥ না ভাই, এখান থেকে আমি নড়ছি নে।

তা হলে আমরা নড়ি। পাড়ার মানুষ আমাদের সইতে পারে না।

পাড়াকে আমরা নাড়া দিই, পাড়া আমাদের তাড়া দেয়।

ওই-যে, চৌপদীর গন্ধ পেয়েছে, মউমাছির গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

পাড়ার লোক॥ ওরে, মাঝির এখানে পাঠ হবে।

কে গো। তোমরাই পাঠ করবে নাকি।

আমরা অন্য অনেক অসহ্য উৎপাত করি, কিন্তু পাঠ করি নে।

ওই পুণ্যের জোরেই আমরা রক্ষা পাব।

পাড়ার লোক॥ এরা বলে কী রে। হেঁয়ালি নাকি।

চন্দ্রহাস॥ আমরা যা নিজে বুঝি তাই বলি; হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ভ্রম হয়। আর, তোমরা যা খুবই বোঝ দাদা তাই তোমাদের বুঝিয়ে বলবে, হঠাৎ গভীর জ্ঞানের কথা বলে মনে হবে।

একজন বালকের প্রবেশ

বালক ॥ আমি পারলুম না। কিছুতে তাকে ধরতে পারলুম না।

কাকে ভাই।

বালক ॥ ওই তোমরা যে বুড়োর খোঁজ করছিলে তাকে।

তাকে দেখেছ নাকি।

বালক ॥ সে বোধ হয় রথে চড়ে গেল।

কোন্ দিকে।

বালক ॥ কিছুই ঠাওরাতে পারলুম না। কিন্তু, তার চাকার ঘূর্ণিহাওয়ায় এখনও ধুলো উড়ছে।

চল্ তবে চল্।

শুকনো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে।

[প্রস্থান

কোটাল ॥ পাগল! উন্মাদ পাগল!

তৃতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকা

প্রবীণের পরাভব

১

বসন্তের হাসির গান

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে।
মরণ-আয়োজনের মাঝে
বসে আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে।
এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক-না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী। হায় হায় রে।
এবার ওকে মজিয়ে দে রে
হিসাব-ভুলের বিষম ফেরে।
কেড়ে নে ওর থলি-থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগলাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে॥

২

আসন্ন মিলনের গান

আর   নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সামনে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে, ভাই, আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগলা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি।
আর   নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
শুনছ না কি জলে স্থলে
জাদুকরের বাজল ভেরি।
দেখছ না কি এই আলোকে
খেলছে হাসি রবির চোখে,
সাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি॥

তৃতীয় দৃশ্য

সন্দেহ

মাঠ

সবাই বলে ওই, ওই, ওই— তার পরে চেয়ে দেখলেই দেখা যায় শুধু ধুলো আর শুকনো পাতা।

তার রথের ধ্বজাটা মেঘের মধ্যে যেন একবার দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু, দিক ভুল হয়ে যায়। এই ভাবি পুবে, এই ভাবি পশ্চিমে।

এমনি করে সমস্ত দিন ধুলো আর ছায়ার পিছনে ঘুরে ঘুরেই হয়রান হয়ে গেলুম।

বেলা যে গেল রে ভাই, বেলা যে গেল।

সত্যি কথা বলি, যতই বেলা যাচ্ছে ততই মনে ভয় ঢুকছে।

মনে হচ্ছে, ভুল করেছি।

সকালবেলাকার আলো কানে-কানে বললে, সাবাস, এগিয়ে চলো! বিকেলবেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারী ঠাট্টা করছে।

ঠকলুম বুঝি রে।

দাদার চৌপদীগুলোর উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা বাড়ছে।

ভয় হচ্ছে আমরাও চৌপদী লিখতে বসে যাব— বড়ো দেরি নেই।

আর, পাড়ার লোক আমাদের ঘিরে বসবে।

আর, এমনি তাদের ভয়ানক উপকার হতে থাকবে যে, তারা এক পা নড়বে না।

আমরা রাত্রিবেলাকার পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকব।

আর, তারা আমাদের চার দিকে কুয়াশার মতো ঘন হয়ে জমবে।

ও ভাই, আমাদের সর্দার এ-সব কথা শুনলে বলবে কী।

ওরে, আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্ছে, সর্দারই আমাদের ঠকিয়েছে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কুঁড়ের সর্দার।

ফিরে চল্ রে। এবার সর্দারের সঙ্গে লড়ব।

বলব, আমরা চলব না— তুই পা কাঁধের উপর মুড়ে বসব। পা-তুটো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরল।

হাত-তুটোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখব।

পিছনের কোনো বালাই নেই রে, যত মুশকিল এই সামনেটাকে নিয়ে।

শরীরে যতগুলো অঙ্গ আছে তার মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সে বলে চিত হয়ে পড়্, চিত হয়ে পড়্।

কাঁচা বয়সে বুকটা বুক ফুলিয়ে চলে, কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর— পড়তেই হয় চিত হয়ে।

গোড়াতেই যদি চিৎপাত দিয়ে শুরু করা যেত তা হলে মাঝখানে উৎপাত থাকত না রে।

আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই-যে ইরা নদী বয়ে চলেছে তার কথা মনে পড়ছে ভাই।

সেদিন মনে হয়েছিল, সে বলছে, চল্, চল্, চল্— আজ মনে হচ্ছে ভুল শুনেছিলুম, সে বলছে, ছল, ছল, ছল। সংসারটা সবই ছল রে।

সে কথা আমাদের পণ্ডিত গোড়াতেই বলেছিল।

এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপে।

পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়।

কী ভুলটাই করেছিলুম। ভেবেছিলুম, চলাটাই বাহাদুরি। কিন্তু না-চলাই যে গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়া সমস্তর উল্টো। সেটাই তো তেজের কথা হল।

ওরে বীর, কোমর বাঁধ্ রে— আমরা চলব না।

ওরে পালোয়ান, তাল ঠুকে বসে পড়্— আমরা চলব না।

চলচ্চিত্তং চলদ্‌বিত্তং— আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই ; আমরা চলব না।

চলজ্জীবনযৌবনং— আমাদের জীবনও থাক্, যৌবনও থাক্ ; আমরা চলব না।

যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছি ফিরে চল্।

না রে, সেখানে ফিরতে হলেও চলতে হবে।

তবে ?

তবে আর কী। যেখানে এসে পড়েছি এইখানেই বসে পড়ি।

মনে করি, এইখানেই বরাবর বসে আছি।

জন্মাবার ঢের আগে থেকে।

মরার ঢের পরে পর্যন্ত।

ঠিক বলেছিস, তা হলে মনটা স্থির থাকবে। আর-কোথাও থেকে এসেছি জানলেই আর-কোথাও যাবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করে।

আর-কোথাওটা বড়ো সর্বনেশে দেশ রে।

সেখানে দেশটা সুদ্ধ চলে। তার পথগুলো চলে।

কিন্তু, আমরা—

গান

মোরা চলব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না।
সূর্য তারা আগুন ভুগে
জ্বলে মরুক যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই-না জ্বালা
জ্বলব না।
বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগরজলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
বলব না।
কোথা হতে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা তো এই প্রাণের টলায়
টলব না॥

ওরে, হাসি রে হাসি!
ওই হাসি শোনা যাচ্ছে।
বাঁচা গেল, এতক্ষণে একটা হাসি শোনা গেল।
যেন গুমটের ঘোমটা খুলে গেল।
এ যেন বৈশাখের এক পশলা বৃষ্টি।

কার হাসি ভাই।

শুনেই বুঝতে পারছিস নে, আমাদের চন্দ্রহাসের হাসি।

কী আশ্চর্য হাসি ওর।

যেন ঝরনার মতো, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।

যেন সূর্যের আলো, কুয়াশার তাড়কারাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে।

যাক, আমাদের চৌপদীর ফাঁড়া কাটল। এবার উঠে পড়্‌।

এবার কাজ ছাড়া কথা নেই— চরাচরমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।

ও আবার কী রকম কথা হল। ঈশানকে এখনও চৌপদীর ভূত ছাড়ে নি।

কীর্তি? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে। কীর্তি তো আমাদের ফেনা— ছড়াতে ছড়াতে চলে যাব। ফিরে তাকাব না।

এসো, ভাই চন্দ্রহাস, এসো, তোমার হাসিমুখ যে।

চন্দ্রহাস॥ বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েছি।

কার কাছ থেকে।

চন্দ্রহাস॥ এই বাউলের কাছ থেকে।

ও কী! ও যে অন্ধ!

চন্দ্রহাস॥ সেইজন্যে ওকে রাস্তা খুঁজতে হয় না,

ও ভিতর থেকে দেখতে পায়।

কী হে ভাই, ঠিক নিয়ে যেতে পারবে তো ?

বাউল॥ ঠিক নিয়ে যাব।

কেমন ক'রে।

বাউল॥ আমি যে পায়ের শব্দ শুনতে পাই।

কান তো আমাদেরও আছে, কিন্তু—

বাউল॥ আমি যে সব দিয়ে শুনি, শুধু কান দিয়ে না।

চন্দ্রহাস॥ রাস্তায় যাকে জিজ্ঞাসা করি বুড়োর কথা শুনলেই আঁৎকে ওঠে, কেবল দেখি এরই ভয় নেই।

ও বোধ হয় চোখে দেখতে পায় না ব'লেই ভয় করে না।

বাউল॥ না গো, আমি কেন ভয় করি নে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল, দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু, চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।

তা হলে এখন চলো। ওই তো সন্ধ্যাতারা উঠেছে।

বাউল॥ আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এসো। গান না গাইলে আমি

রাস্তা পাই নে।

সে কী কথা হে।

বাউল॥ আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়— সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।

গান

ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে।
জানি নে পথ, নাই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্যগভীরে।
ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে।
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চলব আমি নিশীথরাতে,
তোমার হাওয়ার ইশারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি
আজ এই বসন্তসমীরে॥

চতুর্থ দৃশ্যের গীতিভূমিকা

নবীনের জয়

১

প্রত্যাগত যৌবনের গান

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়দ্বারে !
কে গো তুমি। —আমি বকুল।
কে গো তুমি। —আমি পারুল।
তোমরা কে বা। —আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।
এবার যখন ঝরব মোরা ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে।
অফুরানের আঁচল ভ'রে
মরব মোরা প্রাণের সুখে।
তুমি কে গো। —আমি শিমুল।
তুমি কে গো। —কামিনী ফুল।
তোমরা কে বা। —আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে॥

২

নূতন আশার গান

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠবে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন
যৌবনেরই কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

বাঁশিতে গান উঠবে পূরে
নবীন-রবির-বাণী-ভরা
আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে
ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারই নীর
উঠবে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে॥

৩

বোঝাপড়ার গান

এবার তো যৌবনের কাছে
মেনেছ হার মেনেছ ?
—মেনেছি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ ?
—জেনেছি।
আবরণকে বরণ করে
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে,
আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ ?
—এনেছি।
এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
—মেনেছি।
মরণ-মাঝে অমৃতকে জেনেছ ?
—জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধুলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছ ?
—হেনেছি॥

৪

নবীন রূপের গান

এতদিন যে বসেছিলেম

পথ চেয়ে আর কাল গুনে,

দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

বালক বীরের বেশে তুমি

করলে বিশ্বজয়—

এ কী গো বিস্ময়।

অবাক আমি তরুণ গলার

গান শুনে।

গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো

উড়ে তোমার উত্তরী,

কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।

তরুণ হাসির আড়ালে কোন্

আগুন ঢাকা রয়—

এ কী গো বিস্ময়।

অস্ত্র তোমার গোপন রাখ

কোন্ তূণে॥

চতুর্থ দৃশ্য

প্রকাশ

গুহাদ্বার

দেখ্‌ দেখি, ভাই, আবার আমাদের ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেল।

ওকে কি ধরে রাখবার জো আছে।

বসে বিশ্রাম করি আমরা, ও চ'লে বিশ্রাম করে।

অন্ধ বাউলকে নিয়ে সে নদীর ওপারে চলে গেছে।

আর কিছু নয়, ওই অন্ধের অন্ধতার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তবে ও ছাড়বে।

তাই আমাদের সর্দার ওকে ডুবুরি বলে।

চন্দ্রহাস একটু সরে গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না।

ও কাছে থাকলে মনে হয়, কিছু হোক বা না হোক তবু মজা আছে। এমন-কি, বিপদের আশঙ্কা থাকলে মনে হয় সে আরও বেশি মজা।

আজ এই রাত্রে ওর জন্যে মনটা কেমন করছে।

দেখছিস এখানকার হাওয়াটা কেমনতরো ?

এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মতো মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

যারা সেখানে বলছিল 'চল্ চল্', তারা এখানে বলছে 'যাই যাই'।

কথাটা একই, সুরটা আলাদা।

মনটার ভিতরে কেমন ব্যথা দিচ্ছে, তবু লাগছে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে আসছে, এ যেন কোন্ দুপুর-রাতের চোখের জল।

পৃথিবীর দিকে এমন করে কখনও আমরা দেখি নি।

ঊর্ধ্বশ্বাসে যখন সামনে ছুটি তখন সামনের দিকেই চোখ থাকে, চারপাশের দিকে নয়।

বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনই সকলের দিকে চোখ মেলি।

আর, দেখি বড়ো মধুর। যদি সবাই চ'লে চ'লে না যেত তা হলে কি কোনো মাধুরী চোখে পড়ত।

চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তা হলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্ছি, জগৎটা কেবল 'পাব পাব' বলছে না, সঙ্গে সঙ্গেই বলছে 'ছাড়ব ছাড়ব'।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাব'র সঙ্গে 'ছাড়ব'র বিয়ে হয়ে গেছে রে— তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।

অন্ধ বাউল আমাদের এ কোন্ দেশে আনলে, ভাই!

ওই তারাগুলোর দিকে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে যুগে যুগে যাদের ফেলে এসেছি তাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত রাত একেবারে ছেয়ে রয়েছে।

ফুলগুলোর মধ্যে কারা বলছে, 'মনে রেখো, মনে রেখো'। তাদের নাম তো মনে নেই, কিন্তু মন যে উদাস হয়ে ওঠে।

একটা গান না গাইলে বুক ফেটে যাবে।

গান

তুই ফেলে এসেছিস কারে।
মন, মন রে আমার!
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে!
মন, মন রে আমার!
যে পথ দিয়ে চলে এলি
সে পথ এখন ভুলে গেলি,
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে।
মন, মন রে আমার!

নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্মরেতে।
মনে হয় রে, পাব খুঁজি
ফুলের ভাষা যদি বুঝি
যে পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে।
মন, মন রে আমার॥

এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কিরকম সুর লাগছে।

এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়েছিল।

ভেবেছিল, আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

কিন্তু, আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে।

প্রিয়া, এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্ছে আমাদের যা আছে সমস্তই— আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—

চাচ্ছে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ থেকেও লুকিয়ে আছে।

ও যে কিছু পায়, কিছু পায় না, এইজন্যেই ওর কান্না।
পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায়।

ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেব না।

গান

আমি যাব না গো অমনি চলে।
মালা তোমার দেব গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুনশেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাব বলে।
কিছু হল, অনেক বাকি ;
ক্ষমা আমায় করবে না কি।
গান এসেছে, সুর আসে নাই—
হল না যে শোনানো তাই,
সে সুর আমার রইল ঢাকা
নয়নজলে নয়নজলে ॥

ও ভাই, কে যেন গেল বোধ হচ্ছে।

আরে, গেল, গেল, গেল, এ ছাড়া আর তো কিছুই বোধ হচ্ছে না।

আমার গায়ের উপর কোন্ পথিকের কাপড় ঠেকে গেল।

নিয়ে চলো, পথিক, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে, হাওয়া যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে যায়।

কাকে ধরে আনবার জন্যে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু ধরা দেবার জন্যেই মন আকুল হল।

বাউলের প্রবেশ

এই-যে আমাদের বাউল। আমাদের এ কোথায় এনেছ, এখানে সমস্ত পথিক-জগতের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগছে— সমস্ত তারাগুলোর।

আমরা খেলাচ্ছলে বেরিয়েছিলুম কিন্তু খেলাটা যে কী তা ভুলেই গেছি।

আমরা তাকেই ধরতে বেরিয়েছিলুম পৃথিবীর মধ্যে যে বুড়ো।

রাস্তায় সবাই বললে সে ভয়ংকর। সে কেবলমাত্র একটা মুণ্ডু, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যেই তার একমাত্র লোভ।

কিন্তু, ভয় ভেঙে গেছে। মনের ভিতর বলছে, সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে থাকব না। ফুল যাচ্ছে, পাতা যাচ্ছে, নদীর জল যাচ্ছে— তার পিছন পিছন আমিও

যাব।

ও ভাই বাউল, তোমার একতারাতে একটা সুর লাগাও। রাত কত হল কে জানে। হয়তো বা ভোর হয় এল।

বাউলের গান

সবাই যারে সব দিতেছে
তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।
কবার আগে চাবার আগে
আপনি আমায় দেব মেলি।
নেবার বেলা হলেম ঋণী,
ভিড় করেছি, ভয় করি নি,
এখনো ভয় করব না রে—
দেবার খেলা এবার খেলি।
প্রভাত তারই সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে-কুঁদে।
সন্ধ্যা তারে প্রণাম ক'রে
সব সোনা তার দেয় রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে—
আপনাকে, ভাই, ফুরিয়ে দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি॥

ওহে বাউল, চন্দ্রহাস এখনও এল না কেন।

বাউল॥ সে যে গেছে, তা জান না?

গেছে? কোথায় গেছে।

বাউল॥ সে বললে, আমি তাকে জয় করে আনব।

কাকে।

বাউল॥ যাকে সবাই ভয় করে। সে বললে, নইলে আমার কিসের যৌবন।

বাঃ, এ তো বেশ কথা। দাদা গেল পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেল ঠিকানাই নেই!

বাউল॥ সে বললে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ।

তারই ঢেউ?

বাউল॥ হাঁ। খবর এসেছে, মানুষের লড়াই শেষ হয় নি।

বসন্তের এই কি খবর।

বাউল॥ যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে—'আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তা হলে বসন্তের দশা

কী হত।'

চন্দ্রহাস তাই বুঝি খেপে উঠেছে?

বাউল॥ সে বললে—

গান

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার
জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিনহাওয়া
আগুন-জ্বালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছে রে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আনল আমার
বরণডালা।
যৌবনেরই ঝড় উঠেছে
আকাশ-পাতালে।
নাচের তালের ঝংকারে তার
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা,
আরাম বলে, 'এল আমার
যাবার পালা।'

কিন্তু, সে গেল কোথায়।

বাউল ॥ সে বললে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে আনব।

কিন্তু, গেল কোন্ দিকে।

বাউল ॥ সেই গুহার মধ্যে চলে গেছে।

সে কী কথা। সে যে ঘোর অন্ধকার।

কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—

বাউল ॥ সে নিজেই খবর নিতে গেছে।

ফিরবে কখন ?

তুইও যেমন ! সে কি আর ফিরবে !

কিন্তু, চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনের রইল কী।

আমাদের সর্দারের কাছে কী জবাব দেব !

এবার সর্দারও আমাদের ছাড়বে।

যাবার সময় আমাদের কী বলে গেল সে।

বাউল ॥ বললে, 'আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আসব'।

ফিরে আসবে ? কেমন করে জানব।

বাউল ॥ সে তো বললে, 'আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব'।

তা হলে আমরা সমস্ত রাত অপেক্ষা করে থাকব।

বাউল, কোথায় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বাউল ॥ এই-যে গুহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আসছে, এরই মুখের কাছে।

ওই গুহায় কোন্ রাস্তা দিয়ে গেল। ওখানে যে কালো খাঁড়ার মতো অন্ধকার।

বাউল ॥ রাত্রের পাখিগুলোর ডানার শব্দ ধরে গেছে।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন।

বাউল ॥ আমাকে তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে রেখে গেল।

কখন গেছে বলো তো।

বাউল ॥ অনেকক্ষণ— রাতের প্রথম প্রহরেই।

এখন বোধ হয় তিন প্রহর পেরিয়ে গেছে। কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে— গা সির্‌সির্ করছে।

দেখ্ ভাই, স্বপ্ন দেখেছি, যেন তিনজন মেয়েমানুষ চুল এলিয়ে দিয়ে—

তোর স্বপ্নের কথা রেখে দে। ভালো লাগছে না।

সব লক্ষণগুলো কেমন খারাপ ঠেকছে।

পেঁচাটা ডাকছিল, এতক্ষণ কিছু মনে হয় নি, কিন্তু—

মাঠের ওপারে কুকুরটা কিরকম বিশ্রী সুরে চেঁচাচ্ছে শুনছিস!

ঠিক যেন তার পিঠের উপর ডাইনি সওয়ার হয়ে তাকে চাবকাচ্ছে।

যদি ফেরবার হত চন্দ্রহাস এতক্ষণে ফিরত।

রাতটা কেটে গেলে বাঁচা যায়।

শোন্ রে ভাই, মেয়েমানুষের কান্না।

ওরা তো কাঁদছেই— কেবল কাঁদছেই, অথচ কাউকে ধরে রাখতে পারছে না।

নাঃ, আর পারা যায় না— চুপ করে বসে থাকলেই যত কুলক্ষণ দেখা যায়।

চল্, আমরাও যাই— পথ চললেই ভয় থাকে না।

পথ দেখাবে কে।

ওই-যে বাউল আছে।

কী হে, তুমি পথ দেখাতে পার ?

বাউল ॥ পারি।

বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। তুমি চোখে না দেখে পথ বের কর শুধু গান গেয়ে ?

তুমি চন্দ্রহাসকে কী রাস্তা দেখিয়ে দিলে। যদি সে ফিরে আসে তবে তোমাকে বিশ্বাস করব।

ফিরে যদি না আসে তা হলে কিন্তু—

চন্দ্রহাসকে যে আমরা এত ভালোবাসতুম তা জানতুম না।

এতদিন ওকে নিয়ে আমরা যা-খুশি তাই করেছি।

যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়ো, যার সঙ্গে খেলি

তাকে নজর করি নে।

এবার যদি সে ফেরে, তাকে মুহূর্তের জন্যে অনাদর করব না।

আমার মনে হচ্ছে, আমরা কেবলই তাকে দুঃখ দিয়েছি। তার ভালোবাসা সব দুঃখকে ছাড়িয়ে উঠেছিল।

সে যে কী সুন্দর ছিল যখন তাকে চোখে দেখলুম তখন সেটা চোখে পড়ে নি।

গান

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।

খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক-না এখন প্রাণের মেলা—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে॥

ওই বাউলটা চুপ করে বসে থাকে, কথা কয় না—ভালো লাগছে না।

ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ।

যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।

দাও, ভাই, দাও, ওকে বিদায় করে দাও।

না, না, ও বসে আছে তবু একটা ভরসা আছে।

দেখছ না? ওর মুখে কিচ্ছু ভয় নেই।

মনে হচ্ছে, ওর কপালে যেন কী সব খবর আসছে।

ওর সমস্ত গা যেন অনেক দূরের কাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।

ওকে দেখলেই বুঝতে পারি, কে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে।

ওই দেখো, জোড়হাত করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

পুবের দিকে মুখ করে কাকে প্রণাম করছে।

ওখানে তো কিচ্ছুই নেই— একটু আলোর রেখাও না।

একবার জিজ্ঞাসাই করো-না, ও কী দেখছে— কাকে দেখছে।

না, না, এখন ওরে কিছু বোলো না।

আমার কী মনে হচ্ছে জান? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।

যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া-নৌকোটির মতো এসে ঠেকেছে।

ওর মনটা ভোরবেলাকার আকাশের মতো চুপ।

এখনই যেন পাখির গানের ঝড় উঠবে— তার আগে সমস্ত থম্‌থমে।

ওই-যে একটু একটু একতারাতে ঝংকার দিচ্ছে, ওর মন গান গাচ্ছে।

চুপ করো, চুপ করো, ওই গান ধরেছে।

বাউলের গান

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,

জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,

জয়ী জ্যোতির্ময় রে।

এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,

ওহে বীর, হে নির্ভয়।

ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,

অবসাদ দূর হোক,

আশার অরুণালোক

হোক অভ্যুদয় রে ॥

ওই-যে!

চন্দ্রহাস! চন্দ্রহাস!

রোস্ রোস্, ব্যস্ত হোস নে—এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

না, ও চন্দ্রহাস ছাড়া আর-কেউ হতে পারে না।

বাঁচলুম, বাঁচলুম।

এসো, এসো, চন্দ্রহাস।

এতক্ষণ আমাদের ছেড়ে কী করলে, ভাই, বলো।

যাকে ধরতে গিয়েছিলে তাকে ধরতে পেরেছ?

চন্দ্রহাস ॥ ধরেছি তাকে ধরেছি।

কই, তাকে তো দেখছি নে।

চন্দ্রহাস ॥ সে আসছে— এখনই আসছে।

কী তুমি দেখলে আমাকে বলো, ভাই।

চন্দ্রহাস ॥ সে তো আমি বলতে পারব না।

কেন।

চন্দ্রহাস ॥ সে তো আমি চোখ দিয়ে দেখি নি।

তবে?

চন্দ্রহাস ॥ আমার সব দিয়ে দেখেছিলুম।

তা হোক-না— বলো-না, ভাই।

চন্দ্রহাস ॥ আমার সমস্ত দেহ মন যদি কণ্ঠ হত বলতে পারত।

কাকে তুমি ধরেছ তাও কি বুঝতে পারলে না।

জগতের সেই বিরাট বুড়োটাকে?

যে বুড়োটা অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে চায়?

সেই যে ভয়ংকর? যে অন্ধকারের মতো? যার বুকে চোখ?

যার পা উল্‌টো দিকে? যে পিছনে হেঁটে চলে?

নরমুণ্ড যার গলায়? শ্মশানে যার বাস?

চন্দ্রহাস ॥ আমি তো বলতে পারি নে। সে আসছে, এখনই তাকে দেখতে পাব।

ভাই বাউল, তুমি দেখেছ তাকে?

বাউল ॥ হাঁ, এই তো দেখছি।

কই।

বাউল ॥ এই-যে।

ওই-যে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এল।

ওই-যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

চন্দ্রহাস॥ এ কী, এ যে তুমি।

তুমি! সেই আমাদের সর্দার!

আমাদের সর্দার রে!

বুড়ো কোথায়।

সর্দার॥ কোথাও তো নেই।

কোথাও না?

সর্দার॥ না।

তবে সে কী।

সর্দার॥ সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস॥ তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দার॥ হাঁ।

চন্দ্রহাস॥ আর, আমরাই চিরকালের?

সর্দার॥ হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কতরকম মনে করলে তার ঠিক নেই।

সেই ধুলোর ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিনতে পারি নি।

তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল।

তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে, যেন তুমি বালক।

যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম।

চন্দ্রহাস॥ এ তো বড়ো আশ্চর্য। তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!

ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হল। বুড়োকে ধরতে পারলে না।

চন্দ্রহাস॥ আর দেরি না— এবার উৎসব শুরু হোক। সূর্য উঠেছে।

ভাই বাউল, তুমি যদি অমন চুপ করে থাক তা হলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। একটা গান ধরো।

বাউলের গান

তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।
ওগো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,

ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন,
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
তোমার শেষ নাহি তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে,
ওই হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন,
ও মোর ভালোবাসার ধন॥

ওই-যে গুন্ গুন্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।
শুনছি বটে।
ও তো মধুকরের দল নয়, পাড়ার লোক।
তা হলে দাদা আসছে চৌপদী নিয়ে।
দাদা॥ সর্দার নাকি।
সর্দার॥ কী, দাদা।
দাদা॥ ভালোই হয়েছে। চৌপদীগুলো শুনিয়ে দিই।
না, না, গুলো নয়, গুলো নয়। একটা।
দাদা॥ আচ্ছা, ভাই, ভয় নেই, একটাই হবে।

সূর্য এল পূর্বদ্বারে, তূর্য বাজে তার।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার—
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার॥

অর্থাৎ—

আবার অর্থাৎ!

না, এখানে অর্থাৎ চলবে না।

দাদা॥ এর মানে—

না, মানে না। মানে বুঝব না, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

দাদা॥ এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন।

আজ আমাদের উৎসব।

দাদা॥ উৎসব নাকি। তা হলে আমি পাড়ায়—

চন্দ্রহাস॥ না, তোমাকে পাড়ায় যেতে দিচ্ছি নে।

দাদা॥ আমাকে দরকার আছে নাকি।

আছে।

দাদা॥ আমার চৌপদী—

চন্দ্রহাস॥ তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তার অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে।

সুতরাং, অর্থ না থাকলে মানুষের যে দশা হয় তোমার

তাই হবে।

অর্থাৎ, পাড়ার লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে।

কোটাল তোমাকে বলবে অবোধ।

পণ্ডিত বলবে অর্বাচীন।

ঘরের লোক বলবে অনাবশ্যক।

বাইরের লোক বলবে অদ্ভুত।

চন্দ্রহাস॥ আমরা তোমার মাথায় পরাব নবপল্লবের মুকুট।

তোমার গলায় পরাব নবমল্লিকার মালা।

পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর-কেউ তোমার আদর বুঝবে না।

সকলে মিলিয়া

উৎসবের গান

আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছনপানের বাঁধন হতে
চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিনহাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগরতীরে
ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে।
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে॥

-

ফাল্গুনী ১৯১৬ খৃস্টাব্দে (ফাল্গুন ১৩২২) গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়। ইহার 'সূচনা' অংশ 'বৈরাগ্যসাধন' শিরোনামায় সবুজপত্রের ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। মূল নাটক তৎপূর্বেই ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের সবুজপত্র-রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল; উহাতে গীতিভূমিকাগুলি ও সর্বশেষের গানটি নাট্য-বিষয়ের প্রবেশকরূপে 'বসন্তের পালা' নাম দিয়া একত্র গ্রথিত ছিল, অবশিষ্ট অংশেরই নাম ছিল 'ফাল্গুনী'; এই দুইটি অংশের দুইটি পৃথক ভূমিকা ছিল, তাহা সবুজপত্র হইতে নিম্নে যথাক্রমে মুদ্রিত হইল।

ভূমিকা : বসন্তের পালা

আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক ফাল্গুনী বলিয়া একটা নাটকের ধরনের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই বসন্তের পালার গানগুলি তম্বুরার মতো তাহারই মূল সুরকয়টি ধরাইয়া দিতেছে। অতএব এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়াল-নাটকের চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।

একদা এপ্রেলের পয়লা তারিখে কবি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজটা খুব রীতিমত জমিয়াছিল। তার পরে পরিণামে যখন বিল শোধের জন্য অর্থ বাহির করিবার দরকার হইল, তখন কবির আর দেখা পাওয়া গেল না। সেদিনকার এই ছিল কৌতুক। এবারকার এপ্রেলেও কৌতুকটা সেই একই, গোড়াতেই তাহা বলিয়া রাখা ভালো। সবুজ পাতার পাত পাড়িয়া যে-বাসন্তিক ভোজের উদ্যোগ হইল কবি শেষ পর্যন্ত তাহাতে যোগ দিবেন, কিন্তু যখন সেই ভয়ংকর পরিণামের সময়টা

উপস্থিত হইবে, যখন সকলে চীৎকার শব্দে অর্থ দাবি করিতে থাকিবে তখন, হে কবি, 'অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর'!

ভূমিকা : ফাল্গুনী

বসন্তে ঘরছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে। পাড়া জুড়াইয়াছে। ইহাদেরই বসন্তযাপনের কাহিনী কবি লিখিতেছেন। লেখাটা নাট্য কি না তাহা স্থির হয় নাই; ইহা রূপক কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে এবং যিনি লিখিতেছেন তিনি কবি কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর যাই হউক, ইহা ইতিহাস নহে। ইহার সত্যমিথ্যার জন্য মূলে তিনিই দায়ী যিনি জগতে বসন্তের মতো এতবড়ো প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন।

এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানা রকমের আছে। কারও কারও চুল পাকিয়াছে, কিন্তু সে খবরটা এখনও তাদের মনের মধ্যে পৌঁছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সব চেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনও বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্য সে সব-চেয়ে প্রবীণ। আশা আছে, বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ-ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।

ইহারা যাকে সর্দার বলিয়া ডাকে সর্দার ছাড়া তার অন্য কোনো পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার ভয় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে কোনো একটা তত্ত্বের দলে ফেলিয়া ইহার

পঞ্চত্ব ঘটাইতে পারেন। কিন্তু, আমার বিশ্বাস, লোকটা তত্ত্বকথা নহে, সত্যকারই সর্দার। এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া— পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু, যেহেতু সত্যকার সর্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গামা করে না ভিতরে কথা কয়, এই লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে না দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে।

এই কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করার দরকার নাই। যে দলের কথা বলিয়াছি কোনো তালিকায় তাহাদের জনসংখ্যা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। এজন্য তাহাদের সংখ্যার কোনো পরিচয় দেওয়া গেল না। আর, দলের কে যে কোন্ কথাটা বলিতেছে তারও নিদর্শন রাখিলাম না। যে যেটা খুশি বলিতে পারে। কেবল উহাদের মধ্যে যারা কোনো কারণে বিশেষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে তাদেরই কথাগুলোর সঙ্গে তাদের নামের যোগ থাকিবে।

নক্ষত্রলোকের যে কবি নীহারিকার কাব্য লেখেন তিনি আপন খেয়ালমত অনেকখানি আলো ঝাপসা করিয়া আঁকিয়াছেন, তারই মাঝে মাঝে একটা-একটা তারা ফুটিয়া ওঠে। বেশ দেখা যাইতেছে, এই মর্তের লেখকটা তাঁরই নকল করিবার চেষ্টা করে। আলোর নকল কতটা করিতে পারে জানি না, কিন্তু ঝাপসা নকল করিতে চমৎকার হাত পাকাইয়াছে। খুব বড়ো দূরবীন এবং খুব জোরালো অণুবীক্ষণ লাগাইয়াও ইহার মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর, অর্থ? অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।

যত বড়ো লেখা তার চেয়ে ভূমিকা বড়ো হইলে লোকের সুবিধা হয়, এমন-কি, ভূমিকাটাই রাখিয়া লেখাটা বাদ দিতে পারিলেও কোনো উৎপাত থাকে না। কিন্তু, ফাল্গুন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সময় আর বেশি নাই।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি পত্রে (শিলাইদহ, ২০ মাঘ ১৩২২) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে. ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধ হয়।

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়— আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান ; অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারি দিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে, মৃত্যুকে, ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তা হলে অনাদি কালের এই জগৎটা আজ

শতজীর্ণ হয়ে পড়ত; এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধ'সে যেত।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই-যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে, 'ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করি নে— আচ্ছা, দেখ্, যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর্।' প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে, চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।

ফাল্গুনীর সবুজপত্রে প্রকাশিত ভূমিকাসংবলিত পাঠের এবং গীতি-ভূমিকার গানগুলির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। বর্তমান সংস্করণের পাঠ তাহার সাহায্যে স্থানে স্থানে সংশোধিত হইল। পাণ্ডুলিপি-অনুসারে ফাল্গুনী-রচনার তারিখ ও স্থান, ২০ ফাল্গুন ১৩২১, সুরুল।

যে-সকল গানের রচনার তারিখ ও স্থান পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া	১২ ফাল্গুন রাত্রি ১৩২১ সুরুল
আকাশ আমায় ভরল আলোয়	১৩ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
ওগো নদী, আপন বেগে	২৩ ফাল্গুন ১৩২১ রেলপথে
আমরা খুঁজি খেলার সাথি	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো	১২ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
আমরা নূতন প্রাণের চর	১৩ ফাল্গুন প্রভাত [১৩২১] সুরুল
চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে	২৩ ফাল্গুন ১৩২১ রেলপথে
ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
আর নাই যে দেরি	১৪ ফাল্গুন প্রভাত [১৩২১] সুরুল
বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম	১৩ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
এবার তো যৌবনের কাছে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
এতদিন যে বসেছিলেম	১৫ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
চোখের আলোয় দেখেছিলেম	২১ ফাল্গুন প্রাতে [১৩২১] সুরুল
তোমায় নতুন করেই পাব ব'লে	২০ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল